মঙ্গল পাণ্ডের বিচার

শ্রীপান্থ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

এ-বইয়ের সব কয়টি রচনাই শারদীয়া অথবা বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি রচনাই ইতিহাসাশ্রিত। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অর্থে যাকে বলে গবেষণা-কর্ম ঠিক তা নয়। সে-কারণেই বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী, পাদটীকা ইত্যাদি বাদ দেওয়া গেল। ব্যবহৃত পুথিপত্র সম্পর্কে কিছু আভাস রচনার মধ্যেই রয়েছে, কৌতূহলী পাঠকের জন্য আরও কিছু বইয়ের নাম দেওয়া হল।

'মঙ্গল পাণ্ডের বিচার' রচনাটির প্রধান উপজীব্য সামরিক আদালতে তাঁর বিচার। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ নিয়ে অসংখ্য বই রচিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে। গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য : English Historical Writings on the Mutiny 1857-1859, S. B. Chaudhuri, Calcutta, 1979. অধিকাংশ বইয়েই কমবেশি মঙ্গল পাণ্ডের কথা আছে। আমি তাঁর বিস্তৃত কাহিনি পেয়েছিলাম আকস্মিকভাবে হাতে আসা একটি সরকারি দলিলে। নাম — Appendix to Papers relative to the Mutinies in the East India, Inclosures in Nos. 7 to 19, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, 1857.

'নীল আগুন' রচনার প্রতিপাদ্য বিখ্যাত নীল-বিদ্রোহ। এ-সম্পর্কেও বইপত্রের অভাব নেই। বিস্তৃত গ্রন্থতালিকা রয়েছে একাধিক বইয়ে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম : The Blue Mutiny, Blair B Kling, Philadelphia, 1966. তাছাড়া আরও একটি বই আমার ভালো লেগেছিল : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ১৯৬০। আমি এ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম একটি চালু নীলকুঠির কতকগুলো আলোকচিত্র দেখে। আঁকা ছবি নয়, ক্যামেরায় তোলা জীবন্ত সব ছবি। তার কথা পরে।

'ফাঁসিবাজার' পুরানো বিষয় হয়েও একই সঙ্গে নতুন বিষয়। বিচারের নামে ফাঁসি দেশে দেশে এখনও অব্যাহত। সত্তরের দশকে কলকাতার দেওয়ালে একটি মেয়ের ফাঁসি রদ করার দাবি জানিয়ে সেঁটে রাখা একটি প্রাচীরপত্র দেখে আমি তাগিদ অনুভব করেছিলাম এ-বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। তারই ফল এই রচনা। যেসব বই পড়ে উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Hanged by the Neck, Arthur Koestter and C.H. Ralph, London, 1961; Hanged is Error, Leslie, London, 1961; The Executioners, Robert Christophe, London, 1962; The Death Penalty, Amnesty International Report, London, 1979.

'অন্য ডাকাতরা' বলতে আমি একধরনের সামাজিক বিদ্রোহীদের কথাই বলতে চেয়েছি। এ সম্পর্কে চমৎকার দুটি বই : Primitive Rebels, E. J. Hobsbawm,

London, 1959; Bandits, E. J. Hobsbawm, London, 1969. এছাড়া আরও একটি বই আমার কাজে লেগেছে : Patterns of Dacoity in India, A Case Study of Madhya Pradesh, Shyam Sunder Katre, New Delhi, 1972; সম্প্রতি প্রকাশিত আরও একটি বইয়ের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : Robin Hood, J.C.Holt, London, 1982.

চারটি রচনারই মূল কথা এক— প্রতিবাদ। নায়কেরা সবাই, যাকে বলে— বিদ্রোহী। দুই মলাটের মধ্যে একসঙ্গে এইসব রচনা, অতএব আশা করি পাঠকেরা মেনে নিতে আপত্তি করবেন না।

এবার ছবি প্রসঙ্গ।

'মঙ্গল পাণ্ডের বিচার'-এ ব্যবহৃত প্রথম ছবিখানা সমসাময়িক কালে ইংরাজ শিল্পীর আঁকা দিল্লির কাশ্মীর গেট-এ যুদ্ধের দৃশ্য। সাতান্নর মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত একাধিক বইতে ছবিটি রয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটি তখনকার ব্যারাকপুরের রাজভবনের। নেওয়া হয়েছে British Government in India, The Story of the Viceroys and Government Houses, the Marquis Curzon of Kedleston, Vol–I, London, 1925 থেকে।

নীলকুঠির আলোকচিত্রটি কলকাতার প্রাচীনতম ফটোগ্রাফির প্রতিষ্ঠান বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। ওঁদের কাছে সংরক্ষিত কিছু ছবি দেখেই আমি নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন করে উৎসাহিত হয়েছিলাম। বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড -এর বর্তমান সত্ত্বাধিকারী শ্রী জে জে গান্ধী অনুগ্রহ করে আবার একপ্রস্থ ছবি তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। তার জন্য কৃতজ্ঞ। দুঃখিত মাত্র একখানা ছবি ব্যবহার করতে পারা গেল বলে। অন্য ছবিটি কলসওয়ার্দি গ্রান্ট-এর আঁকা নীল গাছ কাটার দৃশ্য। এটি নেওয়া হয়েছে যে বই থেকে তার নাম : Rural Life in Bengal, London, 1866. এটি পাওয়া গেছে বন্ধুবর রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে। তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

'ফাঁসিবাজার'-এর প্রথম ছবিটি ব্রিটেনে একটি পথের ধারের দৃশ্য। ফাঁসির পর মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হত এখানে। এই সুন্দর এবং ভয়াবহ ছবিটি তোলেন আনন্দবাজারের ভূতপূর্ব প্রধান আলোকচিত্রী বীরেন্দ্রনাথ সিংহ। তাঁকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্য দুটি দলিলের একটি কলকাতা হাইকোর্ট এবং অন্যটি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। একটিতে রয়েছে ফাঁসি বাবদে খরচের রসিদ, অন্যটি মৃত্যু পরোয়ানা।

'অন্য ডাকাতরা' রচনায় ব্যবহৃত প্রথম ছবিটি পিণ্ডারি দস্যুর। ব্রিটিশ লাইব্রেরির সৌজন্যে মুদ্রিত। রবিনহুড-এর ছবিটি আনুমানিক ১৭০০ সনের একটি কাঠখোদাই। হব্‌সবাম-এর বই থেকে নেওয়া।

কলকাতা

নভেম্বর, ১৯৮২

শ্রীপান্থ

মঙ্গল পাণ্ডের বিচার ১৩
নীল আগুন ৭১
অন্য ডাকাতরা ৯৭
ফাঁসিবাজার ১২৯

মঙ্গল পাণ্ডের বিচার

— তুমি কি কোনও গোপন কথা প্রকাশ করতে চাও? তোমার কি কিছু বলার আছে?

— না।

— গত রবিবার তুমি কি স্বেচ্ছায় ওই কাজ করেছিলে, না অন্যদের নির্দেশে?

— আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি মৃত্যুই প্রত্যাশা করেছিলাম।

ফৌজী সাহেবরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন। দলে ওঁরা তিনজন। ফিলড অফিসার মেজর ডব্লিউ এ কুক, কোয়ার্টার মাস্টার এফ ই সামিয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার সি গ্রান্ট। সামিয়ার দলের দোভাষী। হার ম্যাজেস্টির ৫৩ নম্বর রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের একটি ঘর। ঘর না বলে গারদ বলাই ঠিক। দরজায় সশস্ত্র পাহারাদার। ওঁদের সামনে একজন ভারতীয় সিপাহি। এতক্ষণ সে একটি দড়ির খাটিয়ার এককোণে জড়সড় হয়ে পড়েছিল। সাহেবদের দেখে কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাহেবরা একনজরে দেখে নিলেন যুবকটিকে। খুবই আহত সে। কাঁধে আর গলায় ব্যান্ডেজ। হাতে কড়া। ওরা তাকে বসতে বললেন। সান্ত্রীকে ইঙ্গিত করলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। তারপর শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই করা হয়েছে এই বন্দিকে নিয়ে। বিচারসভা। সাক্ষীসাবুদ। সওয়াল জবাব। তবু ফৌজি আইনমাফিক সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। রায় কার্যকর হয়ে যাওয়ার আগে অপরাধীর শেষ জবানবন্দি শোনা দরকার। সেটা শুধু কেতা নয়, সমগ্র বাহিনীর পক্ষে জরুরিও বটে। কে জানে, শেষ মুহূর্তে বন্দি হয়তো ভেঙে পড়বে। গড়গড় করে বলে যাবে অন্যদের নাম। কারা কারা ষড়যন্ত্র করেছিল, কী ছিল তাদের মতলব সে-সব গোপন খবর জানা যাবে।

সাহেবরা আশপাশে ঝোপঝাড় পিটাতে শুরু করলেন। আসল প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটু ভণিতা করে নেওয়া ভালো।

— তুমি কি বন্দুকে টোটা ভরেছিলে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য?

— না। আমি অন্যের জীবন নিতে চেয়েছিলাম। বন্দির সাফ উত্তর। স্পষ্টতই সে ক্লান্ত। হয়তো কিছুটা বিরক্তও। কিন্তু ভাষায় কোনও ইতস্তত করার ভান নেই।

—তুমি কি অ্যাডজুট্যানট সাহেবের জীবন নিতে চেয়েছিলে, না অন্য কাউকে সামনে পেলেও গুলি করতে?

— যিনিই আমার সামনে আসতেন তাঁকেই আমি গুলি করতাম। এবারও গলা কাঁপল না তার। গলায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা জড়তা নাই।

বন্দি পরের প্রশ্নের জন্যও যেন তৈরি। সাহেবরা একটু দম নিলেন। ওকে একটু জুড়োতে দেওয়া ভালো।

দু'এক মিনিটের বিরতি। তারপর আরও কিছু প্রশ্ন। একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার। কেননা, এই শেষ সুযোগ। মাঝখানে বড়োজোর একটি দিন। তারপর সব শেষ। পাখি হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বই কী! কিন্তু বৃথাই। প্রতিবারই ওর এক উত্তর— আমার আর কিছু বলার নেই। নিরাশ সাহেবরা খসখস করে লিখে গেলেন তাঁদের প্রতিবেদন— আমরা বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেদিনের ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম। তাকে অভয় দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল গোপন কথা ফাঁস করে দিলে তার নিজের রেজিমেন্ট এখন আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কোনও খবরই সে ফাঁস করল না। তার এক কথা— যা বলার সে তো প্রথমেই বলে দিয়েছি। আমার আর কিছু বলার নেই।

সাহেবরা কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকল সান্ত্রী। দরজায় আর একজন দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে আবার নিজের চারপায়াটিতে শুয়ে পড়ল সে। চোখ তার খোলা। দৃষ্টি উদাসীন। যেন জেগে জেগেই কোনও স্বপ্ন দেখছে। কী ছিল তার সেই স্বপ্নে? গম খেত, আম গাছ, খড়ের ঘর। উত্তরপ্রদেশের কোনও গ্রাম? বৃদ্ধ মা-বাবা। তরুণী বউ। অথবা পাশের গাঁয়ের সে মেয়েটি যে তার বউ হতে পারে বলে শুনেছিল সে, তাকে? নাকি দাউ দাউ আগুন? খেত পুড়ছে। কুঁড়ে পুড়ছে। দালান

পুড়ছে। শহর বন্দর ছাউনি সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা নাচছে। আরামে চোখ বুজল বন্দি।

কোয়ার্টার গার্ডের ওই ঘরে হাতবাঁধা যে আহত যুবকটি ঘুমিয়ে আছে নাম তার — মঙ্গল পাণ্ডে। সে কোম্পানির ফৌজে সামান্য একজন সিপাহি। তবু ইতিহাসে সে অসামান্য পুরুষ। সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহের প্রতীক। আঠারোশো সাতান্নর ভারতীয় মহাবিদ্রোহে প্রথম গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারই হাতের বন্দুক থেকে। বারুদের স্তূপে সে-ই প্রথম ছুঁড়ে দিয়েছিল জ্বলন্ত মশাল। তারপর আর কারও কোনও ভয় নেই। সবাই যেন লহমায় মঙ্গল পাণ্ডে। দিকে দিকে অগণিত পাণ্ডে। বাঙালি ঐতিহাসিকরা লিখতেন পাঁড়ে। মঙ্গল পাণ্ডে সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রথম। সে প্রথম পাণ্ডে। তারপরে যত বিদ্রোহী সবাই পাণ্ডে। ইংরাজ অভিধানকার লিখছেন— পাণ্ডে মানে ১৮৫৭-৫৮ সনে বিদ্রোহে যাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিল তাঁরা। পাণ্ডে তাদের সাধারণ পরিচয়। বোর্সিয়ার নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি লিখছেন— বারাকপুরে প্রথম যে দু'জনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা জাতে ছিল পাণ্ডে। সেই থেকে গোটা ভারতে সিপাহিদের নাম হয়ে গেছে পাণ্ডে। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। চার্লস বেল লিখছেন— "দি নেম হ্যাজ বিকাম এ রিকগনাইজড ডিসটিংশন ফর দি রেবেলিয়াস সিপয়স থ্রু আউট ইনডিয়া।" সাতান্নর মহাবিদ্রোহ নিয়ে রাশি রাশি বই লেখা হয়েছে এ পর্যন্ত। সে-সব বইয়ের যত্রতত্র পাণ্ডে। অবশ্য বানান এক-একজনের এক-এক রকম। যাঁরা একটু বেশি জানেন তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডে এসেছে পণ্ডিত থেকে। তারা উচ্চবর্ণের হিন্দু। ব্রাহ্মণ। সাধারণত ওরা উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দা। সবাই এত খবর রাখেন না। রাখার দরকারও নেই। কর্নেল চিন্তিত। তিনি ভাবছেন— কে জানে, পাণ্ডেরা কী করে বসবে। মেমসাহেব উদ্‌ভ্রান্ত— ওই বুঝি পাণ্ডেরা আসছে! আসছে বিদ্রোহী সিপাহিরা!

মঙ্গল পাণ্ডে তাদের পুরোভাগে। সে প্রথম বিদ্রোহী। সে প্রথম পাণ্ডে। হাজার হাজার সিপাহি তার নাম জানে। একশো পঁচিশ বছর ধরে শত শত ঐতিহাসিকের কলমের মুখে উঁকি দিয়েছে এই নামটি। কিন্তু কেউ

জানেন না খাটিয়ায় পড়ে থাকা ওই যুবকটির গাঁয়ের নাম। কাদের ছেলে সে? কোথায় ছিল তার ঘর? কেমন দেখতে ছিল সে তরুণ? সরকারি কাগজপত্র থেকে এটুকুই জানা যাচ্ছে মঙ্গল পাণ্ডে আর্মির একজন সিপাহির নাম। সে নেটিভ ইনফ্যানট্রির রেজিমেন্টের একজন সিপাই। তার কোম্পানি নম্বর—৫, রেজিমেন্ট নম্বর — ৩৪, নিজের নম্বর— ১৪৪৬। ব্যস, ওইটুকু। আরও একটা খবর আছে সরকারি দলিলে। ১৮৫৭ সনের ৬ এপ্রিল তার বয়স ছিল ২৬ বছর ২ মাস ৯ দিন।

ছাব্বিশ বছরের ওই হিন্দুস্থানী যুবার বুক কতখানি চওড়া ছিল তা অনুমান করতে হলে সেদিনের সিপাহিদের দিকে একবার তাকানো দরকার। সিপাই তখন বশ্যতার আর এক নাম। সতত সে নম্র, ভদ্র, বিনত এবং শৃঙ্খলা-পরায়ণ। কোম্পানি বাহাদুর অনেক কিছু দিয়েছে তাকে। এমনকি শিখিয়েছে স্বপ্ন দেখতেও।

ভারতে কোম্পানির বাহিনীর তখন তিনটি ভাগঃ বেঙ্গল আর্মি, মাদ্রাজ আর্মি এবং বোম্বাই আর্মি। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের মুখে ফৌজে সব মিলিয়ে সৈন্য ছিল ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। কামান— ৫১৬টি। বাহিনীতে ইংরাজ সৈন্য ৫০ হাজার। তাদের মধ্যে ৪৫ হাজারই মোতায়েন উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তিনভাগের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো তখন বেঙ্গল আর্মি। পদাতিক অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। মঙ্গল পাণ্ডে তাদেরই একজন।

বেঙ্গল আর্মির অধিকাংশ সৈন্যই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। অযোধ্যা অঞ্চলের। কিছু বিহারের। ফৌজে তিনজনের মধ্যে দু'জনই ব্রাহ্মণ। কিংবা রাজপুত ক্ষত্রিয়। মূলত তারা চাষি পরিবারের সন্তান। কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার তাদের অজানা নয়। তবে ফৌজে যোগ দিয়েছে তারা লড়াইয়ের নেশায় নয়, কিছু নগদ রোজগারের আশায়। অনেকেই আসতে চায়। সুতরাং, বেছে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। সাহেবরা তাদেরই বাছতেন যাদের চেহারা এবং স্বাস্থ্য চমৎকার। একজন ইংরাজ সেনাপতি লিখেছেন— বেঙ্গল আর্মি সিপাইদের কাছে আমাদের ইংরাজ সৈন্যরা রীতিমতো নিষ্প্রভ। হিন্দুস্থানীদের গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির কম নয়।

কেউ কেউ আরও লম্বা-চওড়া। মঙ্গল পাণ্ডেও হয়তো তাই ছিল। তবে উচ্চতা যাই থাক, সন্দেহ নেই, তার বুক ছিল চওড়া।

আগে আগে সিপাইরা সপরিবারে ক্যান্টনমেন্টে বাস করতেন। মা, বাবা, বউ, ছেলেপুলে সবাই তখন সিপাহির সঙ্গে থাকতেন। ক্যান্টনমেন্টের একদিকে তাদের কুঁড়ের 'লাইন'। ওরা নিজেরাই নিজেদের ঘর তৈরি করিয়ে নিতেন। কোম্পানি কিছু আগাম দিত। পরে মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হত। মাদ্রাজ আর্মিতে সে-ব্যবস্থাই তখনও চালু। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির রীতিনীতি পালটে গেছে। সিপাইরা এখনও নিজের কুটিরে বাস করে বটে, কিন্তু পরিবার পরিজন সঙ্গে থাকে না। খাটিয়া, উনুন, আর যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে তার একার সংসার। নিজেই সে নিজের খাবার বানায়। খাবার মানে চাপাটি। হয় গমের, না হয় বজরার। বজরা সস্তা। তাই বজরাই তাদের পছন্দ। সঙ্গে একটু ডাল। ব্যস। তাই খেয়ে সে তৃপ্ত। বাহিনীর কাজকর্ম সেরে জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম করত, কেউ মুনশির কাছে চিঠি লেখাত। কেউ অন্যের কুটিরে চারপায়ে বসে আড্ডা দেয়। কেউ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়া শোনে। কেউ বা নেশাভাঙ করে। তবে ইংরাজ সৈন্যদের মতো মাতলামি করে না কেউ। দিশি সিপাইরা সাধারণত ভাঙ খায়। বয়স যাদের বেশি তাদের মধ্যে কারও কারও ঝোঁক আফিংয়ের দিকে। কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখা যায় কদাচিৎ। সদাচারী হিসাবে বেঙ্গল আর্মির সিপাইদের খুবই নামডাক। বিশাল বাহিনী। কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় ১৮২৫ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে বেঙ্গল আর্মিতে বিচারসভা বসাতে হয়েছে মাত্র ৩৫ বার। ১৬ বার উপলক্ষ ছিল দলত্যাগ। দলত্যাগ মানে নিজের বাহিনী ছেড়ে শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া নয়, ফৌজ ছেড়ে গাঁয়ে পালিয়ে যাওয়া। অবাধ্য আচরণের জন্য বিচারসভা বসে ৩ বার, ১ বার বিনাকারণে অনুপস্থিত থাকার জন্য, এবং ১ বার ডিউটিতে ঘুমিয়ে থাকার জন্য। মাতলামি বা নেশাগ্রস্ত হয়ে বেসামাল আচরণের জন্য ওই বাহিনীতে কারও বিচার করতে হয়নি। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় জজ-অ্যাডভোকেট প্রশ্ন করেছিলেন— আসামীকে কি বলে দেওয়া হয়েছে যে সে আগে কোনও অপরাধের জন্য সাজা পেয়ে থাকলে এবার সে-প্রসঙ্গও উঠবে। অন্যরা উত্তর দিয়েছিলেন— না, আগে সে কখনও কোনও